দ্বিজ বলে, কি হইবে কহিলে তোম ায়

প্রলয় শূর

আমাদের এই মুলুকটিতে আজ্ঞা জলের বড় কষ্ট - পঞ্চানন বলেছিল।
শুধু কি জলের কষ্ট? ঘর বাড়ি শিক্ষাদীক্ষা খাদ্য বস্ত্র স্বাস্থ্য, বাংলা মুলুকে বেশিরভাগ মানুষের কষ্ট কিসে নেই? আমাদের সেই দুর্দশা, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও ভয়াল জীবনের ছবি যে মানুষটির শিল্পকর্মে চিত্রিত হয়েছে, যেখানে রয়েছে সব ভাঙনের মধ্যেও আমাদের বেঁচে থাকার নানারকম চেষ্টা, যার শেষ ছবিতেও শুনেছি আমরা সংগ্রামী মানুষটি একদিন বসুশ্রী কফিহাউসে অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জীর টেবিলে, সামনের চেয়ারটায় বসে বলেছিলেন, কিছু খাওয়াবি?
কি খাবে বলো?
যা খুশি একটা বল্ না।
ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খাও।
ধুস্শালা, ওসব বানাতে কতো সময় লাগে জানিস্?
তাহলে চিকেন ওমলেট খাও।
ভেজেভুজে আনতে হবে না, কাঁচাই দিতে বল, আমার পেট জ্বলছে। পেটটা পুড়ে যাচ্ছে।
যুক্তি তক্কো আর গপ্পে নীলকণ্ঠ বলেছিল, পুড়ছে সব পুড়ছে, ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে, আমি পুড়ছি। এ আমার কথা। আমাদের সিনেমায় এই আমি আর কোথাও নেই। এই বিশাল ব্যস্ত বাংলাদেশে যিনি মানুষের একটা ঠাঁই খুঁজে বারকরতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষ চলছে একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। একজন ইঞ্জিনিয়ার যুবক, একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, যতো জানোয়ারগুলো বাংলাদেশ থেকে খেদিয়ে দিয়েছে একটি মেয়েকে - সেই নচিকেতা, জগন্নাথ, বঙ্গবালা সকলে ঘরদোর হারিয়ে কে কোথায় চলেছে কেউ জানে না। বাপরে কোতল করল, হাঁটন দিলাম, এই শহর, এই পথে পথে ঘুরি, যাওনের কোনও জায়গা নাই। নীলকণ্ঠের একদিন নবীনত্ব ছিল, অনেক বিশ্বাস ছিল, অনেক উৎসাহ পুঁজি করে সেও একদিন প্রেমে পড়েছিল। অরের মধ্যে এখন আর কিছু নেই। আছে শুধু একটা পাখা। অতএব ওটাই নামিয়ে আনো, বেচে দাও, বোতল আনো, বেচে দাও, বোতল আনো। বঙ্গবালাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো মা? তুমি কি আমার বাংলার - এই বাংলার আত্মা? মন তরে কেবা পার করে? আমি ডাক দিমু কারে? তবু ডাকে, নীলকণ্ঠ ডাকে।
নীলকণ্ঠ বাগচীকে ঘর ছাড়তে হয়েছে। ঘরবাড়ি ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল মেঘে ঢাকা তারা সুবর্ণরেখার মানুষগুলোকে। এদেশে দেশ ভাগের যন্ত্রণার সবচেয়ে সার্থক চিত্র সুবর্ণরেখা। রাসুর বাবা মাস্টারমশাইয়ের বাংলা ছিল গড়ার বাংলা। এ কোন বাংলা যেখানে নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর ধান্দাবাজ পোলিটিশিয়ানের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি। চারপাশে সবকিছু বিপর্যস্ত, তার পেছনে রাজনীতির চক্রান্ত আর দলবাজি। একটা জাতি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। মানুষ তার বাস্তু হারিয়ে কোন্ অজানার পথে চলেছে সে জানে না। মানুষ ছিন্নমূল হয়ে গেল। একথা যিনি প্রথম জানিয়েছিলেন তিনি নিমাই ঘোষ।
যামু ক্যান্ আমার পদ্মামায়ের কোল ছাইর‍্যা যামু ক্যান্। ভাঙন আর ভাঙন। দেশভাগের ফলে এই ভাঙন ছাড়া আর কি

দেখব আমরা? মাতৃপ্রতিমার মতো ভৃগু অনসূয়ার স্বপ্নের মতো একটা বাংলাদেশ তবু উঠে আসে কোমল গান্ধারে। ভিখারি বালক ডাকে মা।

মাতা, মহীয়সী মাতা। নারী, বরাভয় ও ভয়ঙ্করী। শিক্ষক যিনি, তিনি তো বলবেনই, মাতৃত্বের বিভিন্ন প্রকাশ, যা দেবী সর্বভুতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। শক্তি- পঞ্চভূতে ব্যাপিকা শক্তি।

মুহড়া মানে মুখোশ। পঞ্চানন মুখোশগুলো দেখায়। এইটা চন্ডীমূর্তি। এইটা সরস্বতী। এইটা লক্ষ্মী। তোমার হাতে দুর্গামূর্তি। আর একটা এখনও শেষ হয় নাই - এটা সীতা, জনমদুখিনী সীতা। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বঙ্গবালা দুর্গার মুখোশটা দেখছে।

তাঁর মাথার মধ্যে সবসময় কাজ করে একটা মাতৃমূর্তি। পুলিয়ায় গিয়ে তিনি দেখেছেন, মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যেও কিভাবে শিল্পকে ভালোবাসে, খেতে না পাওয়া মানুষও নাচে, সে মানুষ মুখোশ বানায়। সে নিয়ে তিনি ছবি করছেন। অথচ একথা জানিয়ে দিতে তিনি কুন্ঠিত হন না, দ্বিধা বোধ করেন না যে, তথ্যচিত্র সম্পর্কে তিনি খুব বেশি অবহিত নন, তথ্যচিত্র করতে হলে একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা থাকতে হয়, সেটা তাঁর নেই। তবু করেছেন শুধু পেটের দায়ে। তিনি তাঁর ছবির চরিত্রগুলির পেটের দায়ের কথা বলেন, শুধু সেটাই বলেন না, আসে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও শিল্পরূপের কথা, অনসূয়া ভৃগুর নাটকে উৎসাহ আর আদর্শ, দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা, উঠে আসে লোকজীবনের মাতৃমূর্তি, ছৌনাচের মুখোশের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবালা, লোকগান, লোকউৎসব, পুরাণে প্রতীকে হারিয়ে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তৈরি হয় একটা যাত্রাপথ, সময় ও সমাজের টানাপোড়েন, আবহমান ঐতিহ্য। দেশের সংকটকে কোন না কোনও দিক থেকে তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন। মেঘে ঢাকা তারা কোমল গান্ধার সুবর্ণরেখা-এই তিনটি ছবির মধ্যে যোগসূত্র একটাই, তা হচ্ছে দুই বাংলার মিলন। যে পরিমাণে তিনি বিপর্যয়ের কথা বলেন, বিচ্ছিন্নতার চিত্র তুলে ধরেন, মৃত্যুর কাছে যান , পরাজয়ের ছবি আঁকেন, ধবংসের দিকে তাকান, সেই পরিমাণেই তিনি নতুন জীবনের কথা বলেন, সৃষ্টির উৎসে বিস্মিত হন, শিশুর দিকে চেয়ে থাকেন।

যে সহনশীলতা, সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেয়ার মতো যে সহ্যশক্তি, সে কোনও অবস্থার মুখে ভেঙে না পড়ার মতো যে মনের জোর, যে কঠোর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে একটি মেয়েকে আমরা তার দিনগুলো কাটাতে দেখেছিলাম সে মেয়েটির নাম ছিল নীতা। সে চেয়েছিল তার প্রেমিক সনৎ ডুবে থাকুক বিজ্ঞানে, গবেষণায়, সে চেয়েছিল তার দাদা শংকর যে সর্বক্ষণ সকলের তিরস্কারের মধ্যে নির্লজ্জের মতো রেওয়াজ করে চলেছে সে সত্যিকারের বড়ো গায়ক হোক। এই দাদাই তাকে বুঝতে, হ্যাঁরে খুকি, আমি তোদের উপর বড়ো অত্যাচার করি, নারে? ছবির শুতে, বিরাট একটা গাছের ছায়া পড়া পথে নীতা এগিয়ে এসেছিল। দাদা শংকর তখন গলা সাধছে।

নীতা যখন এগিয়ে এসে দাদাকে টাকাটা দেয়, শঙ্কর টাকাটা হাতে নিয়ে পরম আদে বলে, এক পাত্তি? নীতা তাকে বলে, চুল কেটে চেহারাটা মানুষের মতো করো। এক জোড়া চটি কেনো।

শংকর ভালোবাসে তার বোনকে, তোর কপালে দুঃখ নির্ঘাত। দ্যাখ্, এই পরের দুঃখে যারা কাঁদে না, যাদের কষ্ট হয়, তাদের কষ্ট কিন্তু কোনওদিন ঘোচে না।

ঠিকই বলেছে শংকর। নীতার কষ্ট কমেনি, দিনে দিনে শুধু বেড়েছে। তোমার খুকি কিছু বোঝে না মা, তোমার খুকি বড্ড ছেলেমানুষ। ইয়েট্স, কীটস পড়া বাবাও তাকে বুঝত, সেকালে মানুষে গঙ্গাযাত্রীর গলায় ঝুলাইয়া দিত মাইয়া। তারা ছিল বর্বর। আর একালে আমরা, শিক্ষিত সিভিলাইজড, তাই লিখাপড়া শিখাইয়া মাইয়ারে নিঙড়াইয়া ডাইলা পিষ্যা মুইছা ফেলি তার ভবিষ্যৎ।

তাই পাহাড় নীতাদের কাছে পাহাড় নয়, পাহাড় শেষপর্যন্ত স্যানাটোরিয়াম। তাঁর ছবিতে সব কিছুই উঠে আসে বাস্তব, নিষ্ঠুর বাস্তব থেকে। যে বাস্তবে মানুষ গানও গাইছে। লাগি লগন পতি সখি সন। তবু শব্দ কেন চাবুকের শব্দ শুধু? কেন রোজ সন্ধেবেলা জ্বর আসে? খুকির শরীরটা ক্ষয়ে যায়। কারে কয় না। বাসনটা পর্যন্ত নিজে মাজে। জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে। কেউ আসে না। অন্ধকারে রইনু পড়ে। কেউ দেখতে আসে না। বাবা শুধু বলে, আই অ্যাকিউজ। কাকে অ্যাকিউজ করছেন তিনি? কার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন? শংকরের প্রশ্নের উত্তরে হেরে যাওয়া শিক্ষিত বাবার হাতটা নেমে আসে।

রাস্তাটা তখন পাহাড়ি রাস্তার দিকে চলে গেছে। দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি ঢাল। মেঘে ঢাকা বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা। ঝোরা নেমে আসছে। গাছের সারি, পাইনবন, উপত্যকা, লোকবসতি, আকাশ দেখা যাচ্ছে। তারই মধ্যে অন্তত বারো চোদ্দবার নীতার গলায় একটাই কথা শোনা যেতে থাকে, দাদা আমি বাঁচব। নীতার গলা আকাশ বাতাস পাহাড়ে প্রতিধবনিত হতে থাকে।

নামাজ আমার হইল না আদায়, নামাজ আমি পড়তে পারলাম না। এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না, মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে। নীতা ক্লান্ত, বাসন্তী ক্লান্ত, নীলকণ্ঠ ক্লান্ত। ভাঙ্গনের পথে নীলকণ্ঠ একলা হেঁটে যায়। কিঞ্চিত মাতাল। বাকি রাতটা শালবনে কাটাতে চায়। দূর্গাকে তিনি বলেছিলেন, কাল সকালে কিছু রেঁধে নিয়ে ওই শালবনে আসতে পারবে? খুব ভোরে আমি রওনা হতে চাই। সঙ্গে সত্যকে এনো। কারণ প্রথম ভোরের আলোয় তার মুখটা তিনি দেখতে চান। ওর ওই ছবিটাই মনের মধ্যে গড়ে তিনি চলে যেতে চান।

একটা খাঁটি গুণী লোক ছিল মদন তাঁতী। সস্তা কাপড় বুনবেই না। নীলকণ্ঠও ওই মদনের মতো বড় খামখেয়ালি একগুঁয়ে। এই রাগে, এই হাসে। যখন আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তখনও মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ভুবনকে মদন বলেছিল, ভালো কিছু বোনান না, একটা দামি কিছু। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে?

আমাদের এই পরিচালক জানাতেন, আমাদের সমস্ত সমাজ, আমাদের সমস্ত ইকনমি ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সে, ব্ল্যাক মানিতে ছেয়ে ফেলেছে আমাদের সব দিক থেকে। সিনেমার সবচেয়ে কঠিন দিকটা হচ্ছে টাকা জোগাড় করা। সে টাকা পাবার জন্যে সবরকম ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাত মেলানো যায় না।

যে সমস্যা তাঁতী পাড়ায় সেই একই সমস্যা সিনেমা পাড়ায়। ভালো কিছু বোনাবার জন্য কার দায় পড়েছে। কে দেবে অ ালো নয়, কে দেবে টাকা। যে কারণে কাঞ্চনজঙঘা বক্সঅফিসে মার খায় সেই একই কারণে কোমল গান্ধার মার খায়। দুটি ছবিই, দুরকম আঙ্গিকে, এ দেশীয় সিনেমার সময় থেকে অনেক এগিয়ে থাকা। যেমন, অযান্ত্রিক।

খালি তাঁতের সামনে মদন তাঁতীকে যেমন দিনের পর দিন বসে থাকতে হয়েছে, এই চলচিচত্রকারকেও তেমনি কাজ ছাড়া বসে থাকতে হয়েছে। মাথার মধ্যে তখন একটার পর একটা দৃশ্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু চিত্রনাট্য লিখে কাকে শোনাবেন তিনি? অথচ এতদিন কাজের মধ্যেই ছিলেন। শিল্প ও রাজনীতির মধ্যেই ছিলেন। নাটক লিখেছেন, নাটক করেছেন, গল্প লিখেছেন, পার্টি করেছেন, অসুস্থ হয়েছেন, হাসপাতালে গিয়েছেন। নতুন কোনও বিষয় ঘুরছে তাঁর মাথার মধ্যে। সব কিছু কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গোকর্ণ গ্রামে যার বাড়ি তার কথা যেমন ভাবছেন, তেমনি হয়তো চিত্রনাট্যে গুছিয়ে নেওয়ার কথা ভ াবছেন শচীশ, শ্রীবিলাস দামিনীকে। বুঝতে পারছেন তিতাস এখানে হয় না। ওই জল ওই জমি ওই চর ওই নৌকো চাই। সব কিছু প্রত্যাখান করে কেউ একা বাঁচে না। নচিকেতার হাতদুটো গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে বঙ্গবালার হাতটা খুঁজে পায়। আমি ভৃগুকে ছাড়া বাঁচব না। অনসূয়ার মুখ বাংলার মুখ হয়ে ওঠে। নীলকণ্ঠ চেয়েছিলেন জীবনের নক্সাটাকে পাল্টাতে। তোমার ওই গান কি একটা কান্ডকরে দিয়েছে, মা। মাতৃকা, জননী, গর্ভধারিনী, শক্তি।

তিনি জানতেন যে, তাঁর জেনারেশনটা বাস্তবের সঙ্গে নাড়ির যোগ হারিয়েছে। হয় তারা বিভ্রান্ত, আর নয়তো কাপুষ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মিছিল। কোনও যুবক যদি তাঁকে ক্ষয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবী বলে, মাতাল বলে, তাতেও তিনি নিজের সমর্থনে কিছু বলতে চান না, কোনও যুক্তি খাড়া করতে চান না, তখন তিনি বরং আরও একটু মদ্যপান করতে চান। মনে করিয়ে দেন, এদেশেই সবচেয়ে উজ্জ্বল দার্শনিক চিন্তার মানুষগুলো ছিল। এবং তিনি একথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন যে, নাম যশ, মানুষ খুন করে পয়সা জোটানোর জন্য একটি মিথ্যেও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবে না। কিন্তু তিনি জানেন না, আজকে কোন্ সিদ্ধান্ত বাংলার এই অবস্থায় সঠিক পথের নির্দেশ দেবে, কারণ নিজের সম্পর্কে তঁ ার মনে হয়, আমি কনফিউজড্, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

যারা ভবিষ্যতকে ছিনিয়ে আনবে তাদের মধ্যেই তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। থাকতে পারেন নি। সব অবলুপ্ত। যুক্তি তক্কো আর গপ্পো তাঁর নিজের বিদ্ধে নিজের কথা। তিনিই সেই ব্যক্তি, সেই প্রতিভা, যিনি ক্রমাগত নিজেকে আঘাত করেছেন। কে ানও পরিচালক তাঁর সৃষ্টি কর্মে এভাবে নিজের ব্যর্থতার কথা কখনও বলেন নি। নীলকণ্ঠ গুলিবিদ্ধ হয়, পুলিশের হাতে, সময়ের হাতে। ঘোলাটে চোখে, যন্ত্রণার মধ্যে সে পুত্রকে দেখল, সত্যকে দেখল। জীবন, জীবিতের ধর্ম বহতা, দুর্নিবার।

সব অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা পার হয়ে তিনি চলে গেলেন, নৈশ তিমিরে নয়, প্রভাত আলোতে। কাঙ্খনীয় কিছু তিনি পান নি, নচিকেতা বঙ্গবালা সত্যরা কি পাবে, তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি দেখে গেলেন যে, তারা আছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com